BL College Journal Volume -1, Issue-1, 2019
pp 48-58

সত্যজিতের গদ্যশৈলী : প্রসঙ্গ ফেলুদা সিরিজ

ড. জাহ্নবী দাশ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, লামডিং কলেজ, অসম, ভারত
ই-মেইল : dbjjahnabi@gmail.com

সংক্ষিপ্তসার

ফ্যাশনটা হলো মুখোস আর স্টাইলটা হলো মুখশ্রী। উপলব্ধি অনুভূতি বা চিন্তা থেকেই মূলত স্টাইলের উৎপত্তি। ব্যক্তিভেদে তাই পাল্টে যায় স্টাইলও। বিশ্ববরেণ্য চিত্রপরিচালক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কথ্যবুলির বিরামহীন স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে বাংলা সাহিত্যে সত্যজিতের উপস্থিতি।

বীজ শব্দ : স্টাইল, সংযম, ডিটেলিং, মনন, সত্যজিৎ।

ভূমিকা : বিশ্বের মানচিত্রে একটি সগর্ব অধ্যায় সত্যজিৎ রায়। ভীষণভাবে বাঙালি এবং একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক। দু'পকেটে মুঠো মুঠো শৈশব নিয়ে জন্মেছিলেন মনীষা ও মননের এই কিংবদন্তি। সত্যজিৎকে সর্বকালের তিনজন চিত্র পরিচালকের অন্যতম বলে মেনে নিয়েছে তাবৎ বিশ্ব (অন্য দুজন হলেন চার্লি চ্যাপলিন ও ইঙ্গমার বার্গম্যান)। তিনি একাধারে সঙ্গীত পরিচালক, চিত্রশিল্পী এবং সাহিত্যিক। সিনেমা থেকে চিত্রনাট্য, ক্যালিগ্রাফি, কোরিওগ্রাফি, প্রচ্ছদ থেকে অন্তরপট, গোয়েন্দা গল্প থেকে শুরু করে কল্পবিজ্ঞান সবকিছুতেই তিনি ছিলেন সব্যসাচী। ক্যামেরার পিছনে থেকে গোটা ফিল্মকে যেভাবে আয়ত্তে রাখার ক্ষমতা ছিল ঠিক তেমনি লেখক হিসেবেও দৃষ্টি ছিল ছোট বড়ো প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর। দেড়শো বছরের পুরনো আধুনিক রহস্য কাহিনির যে ধারা চলে আসছে, তারই প্রবাহে লেখনী ভাসিয়ে দিলে নতুন গল্প সৃষ্টি করা যাবে না, একথা জানতেন তিনি। ঠিক যেভাবে গ্রাফিক্স ডিজাইনের শুরুতেই ভেঙে দিয়েছিলেন ৯০° বিজ্ঞাপনের প্রতিটি লাইন সাজানোর চিরাচরিত প্রথাকে। সরাসরি ক্রাইমের বর্ণনা না দিয়েও ফেলুদার কাহিনি জুড়ে টানটান রহস্য আর সাসপেন্স বর্তমান। রুচিশীল উইট, গল্পের নিটোল বুনোন, ঝকঝকে স্মার্ট ভাষায় ফেলুদা সিরিজের প্রতিটি গল্পই 'Unputdownable'।

সত্যজিৎ যখন লেখালেখি শুরু করেন বাংলা সাহিত্যে তখন শেষ হতে চলেছে ষাটের দশক। মূলত 'সন্দেশ' পত্রিকাকে বাঁচিয়ে তোলার তাগিদেই তাঁর কলম ধরা।

'সন্দেশ' -এর একটি সংখ্যায় স্বয়ং লেখক জানাচ্ছেন, "আমার একটা মনে ইচ্ছা ছিল। 'সন্দেশ' যদি আর একবার বের করা যায় তাহলে মন্দ হয় না। ..... তারপরেই ১৯৬১ সালের মে মাসে 'সন্দেশ' বের হয়।

..... আমি কোনদিন লিখব এটা ধারণা ছিল না। কোনদিন যে আমি গল্প, কবিতা লিখব একথা আমার মনেও হয়নি। ..... 'সন্দেশ' বের হওয়ার পর সন্দেশের পাতায় যাবে এই মনে করে আমি প্রথমে লিখতে শুরু করি, তাও অনুবাদ। ..... তারপরে গল্প। কিন্তু একবার যখন শুরু করলাম তখন আর থামার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। আমি ক্রমাগত লিখে গেলাম।"[১] বাংলা কথাসাহিত্যের সোনালী যুগ যখন প্রায় শেষ ঠিক তখনই লেখার মধ্যে এলেন সত্যজিৎ। মূল্যবোধের বিনষ্টি, চারিত্রিক অধঃপতন, শৌখিন যুগযন্ত্রণার ভণ্ডামি ইত্যাদি নিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই বাংলা গল্প তখন দিশাহারা। সত্যজিৎ ইচ্ছে করেই সে পথে হাঁটেননি। আসলে সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার মূল সুরটা শুরু থেকেই চিনতে পেরেছিলেন তিনি। ৬০ দশকের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যে বাঙালির মূল্যবোধ সৃষ্টিতে কোনো সাহায্যই করেনি এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল তাঁর। কিশোর মনস্তত্ত্বটা বরাবরই খুব ভালো বুঝতেন তিনি। বিশ্বাস করতেন ছোটদের মন আকাশের মতো বিস্তৃত, সমুদ্রের মতো গভীর। 'পথের পাঁচালী' বা 'শাখা প্রশাখা' সিনেমায় শিশুমনের সেই বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধারই ইঙ্গিত দেখি আমরা। সস্তা, উত্তেজনা, হিংসা বা খুনখারাপি অথবা পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য বই আসলে শৈশবকে হত্যা করে। কিশোর মনে এর ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন তিনি। ছোটদের মন কীভাবে ভয় পায়, কীভাবে যন্ত্রণায় দুমড়ে যায় তা আমরা দেখেছি শিবুতে (সদানন্দের খুদে জগৎ), নয়নে (নয়ন রহস্য), (ফটিকচাঁদে), বিবিতে (ছিন্নমস্তার অভিশাপ), মুকুলে (সোনার কেল্লা) বা রুকুতে (জয় বাবা ফেলুনাথ)। এই যে আতঙ্ক বা মানসিক কষ্ট এর ফলে ধ্বংস হতে পারে এদের গোটা ভবিষ্যৎটাই। শিশুদের প্রতি এই যে ভালোবাসা, তা থেকেই ফেলুদা। চিন্তনের স্বচ্ছতা এবং অননুকরণীয় ভাষার বিস্ময় দিয়ে আট থেকে আশি – সব বয়সের পাঠককে লুঠ করেছেন সত্যজিৎ। জীবন জিজ্ঞাসার নিগূঢ়তাকে স্পর্শ করে পৌঁছেছেন 'এসথেটিক প্লেজার'-এ। ফিলিপ সিডনির একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখ করতেই হয়, "With a tale, for sooth, he cometh unto you; with a tale which holdeth children from play and old men from the chimney corner"[২] ফেলুদা সিরিজের গল্পগুলো আসলে তাই।

চলচ্চিত্র পরিচালকের মুখ্য হাতিয়ার যেমন ইমেজ ও শব্দ, লেখকের হাতে তেমনি কথা। এখানে যদি মুনশিয়ানার অভাব হয়, ভেতরের ওঠাপড়া যদি রচয়িতার আয়ত্তে না থাকে এবং প্লট যদি শক্তিশালী না হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তা কালজয়ী হতে পারে না। এ বিষয়ে সত্যজিৎ লিখছেন, "এত যে লেখা হয়, তার কতটুকুই বা সাহিত্য হয়ে ওঠে। শিল্পী আগে, তারপরে তো শিল্প। যেখানে শিল্পী নেই, সেখানে শিল্পের উপকরণ থাকলেও শিল্পের উদ্ভব সম্ভব নয়।"[৩] চলচ্চিত্রের মতো সত্যজিতের সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ স্বচ্ছতা, ঋজুতা, স্পষ্টতা এবং অবশ্যই সাবলীলতা। চরিত্র ও পরিবেশের নিখুঁত বর্ণনা এবং বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক তাঁর ভাষার বাড়তি আকর্ষণ। বাক্যগুলি অনতিদীর্ঘ ও নিরলংকৃত এবং যেটা সবচেয়ে অনবদ্য সেটা হলো অতিনাটকীয়তার একান্ত অভাব। Sensetional বা Melodramatic ব্যাপারটাই অপছন্দ ছিল তাঁর। শ্রীরায়ের পরিশীলন, পরিচ্ছন্ন মনের ছাপ সিনেমায় যেমন রয়েছে, তেমনি উপলব্ধ হয়েছে সাহিত্যেও। ডিটেলিং-এর এতো চমৎকার ব্যবহার করেছেন তিনি যার ফলে তাঁর গল্প আমরা যে শুধু পড়ি তা নয়, প্রতিটি দৃশ্যই চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে সিনেমার মতোই। কোনো মানুষ, কোনো অনুভূতি বা ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে

সত্যজিৎ ঠিক ততটুকুই দেখিয়েছেন যতটুকু দরকার। ফেলুদা সিরিজের ন্যারেটর তোপসে। তোপসের বয়সী স্মার্ট, চৌকস বাঙালি ছেলেরা যে ভাষায় কথা বলে ফেলুদার কাহিনিতে ঠিক সেই ভাষাই ব্যবহার করেছেন লেখক। যাদের প্রত্যক্ষ পাঠক হিসেবে নিয়েছেন তিনি, সেই কিশোরদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এর ফলে বেড়ে গেছে অনেকখানি। তাঁর গদ্যে কোথাও কোনো আড়ষ্টতা নেই। আমতা-আমতা ভাব নেই। বোকামি নেই। 'ছোট্ট সোনা' মার্কা ন্যাকামি কোনোদিনই পছন্দ করতেন না তিনি। গল্পে যেমন কোথাও বাহুল্য নেই তেমনি ভাষায় নেই কোনো আলগা ভাব। যথার্থ বলেছেন লীলা মজুমদার, "বাড়তি একটা শব্দ খুঁজতে হলেও, সেই গোলমেলে কেসটা ফেলুদাকেই দিতে হবে।"[৪]

উদ্দেশ্য : সত্যজিৎ রায় শিল্প সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি চিহ্নিত অধ্যায়। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তিনি সর্বজনস্বীকৃত ব্যক্তিত্ব। ছবি আঁকা, চিত্রনাট্য বা সংলাপ নয় শুধু, বিজ্ঞাপনের প্রচার এবং সম্পাদনাতেও তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। সত্যজিৎ জানতেন একটি ভালো ছবিকে নষ্ট করে দিতে পারে বেমানান আবহসঙ্গীত। বাংলা সিনেমার পোস্টারের ধারাটাই আমূল বদলে দিয়েছিলেন তিনি। প্রচ্ছদশিল্প বিস্ময়কর সমৃদ্ধি পেয়েছিল তাঁরই হাতে। বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, ঠোক্করহীন ভাষার গুণে ও উপস্থাপনের কৌশলে ফেলুদার রহস্য কাহিনি, প্রফেসর শঙ্কুর অ্যাডভেঞ্চার, তারিণী খুড়োর কীর্তিকলাপ, এক ডজন গপ্পো বাংলা সাহিত্যের শাশ্বত সম্পদ। বহুমুখী এই প্রতিভার সমস্ত পরিচয়কে মেনে নিয়েও বলতে হয় গদ্যশিল্পী হিসেবেও সত্যজিৎ বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়রহিত। বাংলা অক্ষর বিন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নতুন পথের দিশারী। স্মার্ট, ঝকঝকে, একান্ত স্বাভাবিক ভাষা নিয়ে বাংলা গদ্যের রূপটাই বদলে দিয়েছেন তিনি। এখানে স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে লেখক হিসেবে তাঁর আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তার একটি অন্যতম দিক গদ্যভাষার অনন্যতা। আলোচ্য গবেষণাপত্রে ফেলুদা সিরিজে সত্যজিতের সেই অননুকরণীয় গদ্য সম্পর্কেই আমরা আলোচনা করার প্রয়াস করেছি।

সাহিত্যিক প্রকাশনা : কিংবদন্তী সত্যজিতের বিভিন্ন সৃষ্টিকর্ম নিয়ে পৃথিবী জুড়েই চলছে গবেষণা। তবে গদ্যশিল্পী সত্যজিৎ নিয়ে খুব বেশি গবেষণা সম্ভবত এখনও হয়নি। উজ্জ্বল কুমার চক্রবর্তী এবং সুখেন বিশ্বাস এ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করেছেন।

পদ্ধতি : গবেষণা পত্রটি লিখতে গিয়ে মূলত ব্যবহৃত হয়েছে বর্ণনাত্মক পদ্ধতি। মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে বিভিন্ন বই পত্র এবং পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

বিশ্লেষণ : শৈলী বা রীতি স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেক শিল্পীর স্বতন্ত্র। আমরা যাকে বলি স্টাইল। স্টাইল লেখকের ব্যক্তিত্বকেই তুলে ধরে। শিল্পীর চিন্তন-মনন-অনুভূতি-উপলব্ধি থেকেই এর উৎপত্তি। রায় চৌধুরী পরিবারের ঐতিহ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে সত্যজিতের ছিলই। রুচিশীল সুপ্রভা দেবীর চারপাশে আবর্তিত হয়েছে তাঁর শৈশব। ভবানীপুরের মামার বাড়ির প্রভাবও কিছু কম ছিল না। ছোটবেলা থেকেই মামাদের সঙ্গে প্রচুর সিনেমা দেখতেন তিনি। 'ম্যাজিক ল্যান্টার্ন' সিনেমা সম্পর্কে তাঁর মনে প্রথম নেশা ধরায়। 'Boy's Own Paper', 'Photopay', 'Film Pictorial' ইত্যাদি পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন তিনি। সত্যজিৎ যখন ক্লাস নাইনের ছাত্র, সুপ্রভা দেবী তখন বেলতলা রোডের বাড়িতে চলে আসেন। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াকালীন সত্যজিৎ ব্যস্ত ছিলেন বহুমুখী জ্ঞান অর্জনে। একই সঙ্গে চলতে থাকে সঙ্গীতচর্চা, ফটোগ্রাফি, শিল্পচর্চা, ইংরেজি সাহিত্যের রসাস্বাদন। বাখ, বেটোফেন ও মোসার্ট ছিলেন, তাঁর জীবনসঙ্গী। কলকাতা সিম্ফনি অর্কেস্ট্রার কনসার্টের নিয়মিত শ্রোতা ছিলেন তিনি। শান্তিনিকেতনে পড়তে এসে চিনলেন গ্রাম, শিল্পের স্বরূপ। সমকালীন দেশ কাল সমাজ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন ছেলেবেলা থেকেই। একনিষ্ঠতা ও গভীর শৃঙ্খলাবোধ ছিল তাঁর স্বভাবজাত।

ভাষারীতি যেকোনো গদ্যশৈলীর প্রধান অংশ। শব্দনির্বাচন, বাক্যগঠন, অলংকারের যথাযথ প্রয়োগ, অনুচ্ছেদসমূহের বিন্যাস ও সজ্জা – এসমস্তই ভাষারীতির অন্তর্গত। সত্যজিতের সাহিত্যরীতি চিত্রধর্মী। শৈলীর দিক দিয়ে দৃশ্যরস ও দৃশ্যভঙ্গীই তাঁর রচনায় প্রধান হয়ে উঠেছে। চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে ভিজুয়াল মেজাজটা তাঁর ছিলই। সত্যজিৎ জানতেন একই কথা বিভিন্ন মুহূর্তে আমরা বিভিন্নভাবে বলে থাকি। নিরুদ্বিগ্ন অবস্থায় আমাদের কথার লয় হয় বিলম্বিত। আবার উত্তেজনার বশে আমরা একটানা কথা বলতে পারিনা, কথা কেটে কেটে যায়। আবার শ্রেণিগত পার্থক্যের সঙ্গে বদলে যায় ভাষার ব্যবহারও। একজন কল্পনাপ্রবণ মানুষ যে ভাষায় কথা বলে একজন চূড়ান্ত প্রাকটিক্যাল মানুষ নিশ্চিত ভাবেই সেভাবে কথা বলে না। মগনলাল মেঘরাজের সঙ্গে বনবিহারী সরকারের ভাষায় তাই বিস্তর ফারাক। নিশিকান্তবাবু আর কারাণ্ডিকারের কথা বলার রীতি আলাদা। শিক্ষিত বাঙালির সংলাপে ইংরেজির ব্যবহার আজকের ঘটনা নয়। কেউ কেউ শুদ্ধ বাংলা যে বলেন না তা নয়, কিন্তু সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি বাংলায় ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলতেই পছন্দ করে বেশি। এসব কিছুই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি সত্যজিতের। স্বল্প কথায় কীভাবে বেশি বলা যায় এটা তিনি জানতেন। তাঁর স্টাইলটা কখনোই চীৎকৃত ছিলনা। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যথার্থ মন্তব্য করেছেন, "নিখুঁত বর্ণনা, স্বাদু স্বাভাবিক সংলাপ, বিচিত্র সব বিষয়। আর শৈলী? ওটাকে লুকিয়ে রাখাই যে সেরা শৈলী, সত্যজিতের গল্প যখন পড়ি, এই কথাটা নতুন করে আবার মনে পড়ে যায়।"[৫]

সিনেমা হোক বা গল্প উপন্যাস, পরিবেশকে বাস্তবানুগ করে তুলতে ইনসিডেন্টাল সাউন্ডের জুড়ি নেই। সত্যজিতের সাউন্ডট্র্যাকে গভীরতর অর্থে এক চারুশিল্প। কীভাবে শব্দের জগৎকে বিশ্লেষণ করে সত্যজিতের চেতনা, ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চারের গল্পগুলিতে ব্যপ্ত হয়ে আছে তারই সূত্র। মননশীল সত্যজিৎ সুপরিকল্পিতভাবে সাজিয়েছেন তাঁর শব্দবিশ্ব। খুব কাছের কোনো শব্দের সঙ্গে একটা খুব দূরের শব্দ ব্যবহার করেছেন তিনি। তীক্ষ্ণ আর কোমল শব্দকে পাশাপাশি যেমন বসিয়েছেন ঠিক তেমনি সুরেলা শব্দের পাশেই বেজেছে বেসুরো শব্দ। রহস্য গল্পের টানটান, উত্তেজনা, সাসপেন্স ইত্যাদি বোঝাতে অহেতুক বর্ণনার প্রয়োজনই হয়নি তাঁর। পরপর কয়েকটি বিপরীতধর্মী শব্দের সুচিন্তিত প্রয়োগ তাঁকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছে। শব্দ সৃষ্টিকারী কোনো চলমান বস্তু দৃশ্যে থাকলে স্পেসের গভীরতা বেড়ে যায়। তখন দৃশ্যের অন্যান্য শব্দের স্থিরতার সঙ্গে একটা চমৎকার বৈপরীত্য তৈরি হয়। 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি'তে সাইকেলের বেল সেই কাজই করেছে। আসলে বিপরীতধর্মী শব্দকে 'ওভারল্যাপ করিয়ে করিয়ে শব্দের কলরব' সৃষ্টি করা সত্যজিতের শৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'অপুর সংসার' সিনেমায় সেজন্যই বাঁশি আর সেতারের সুরেলা শব্দের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন বেসুরো আওয়াজ – ঝাঁটা আছড়ানো আর রেল ইঞ্জিনের ফোঁস ফোঁস। রহস্যের সন্ধানে ছোট্ট শহর খুলনাবাদে এসে তোপসে ঠিক যেভাবে জুড়ে দিয়েছিল সুরেলা গানের সঙ্গে দুটো লোকের

বেসুরো তর্কাতর্কি। কারণ বাস্তবে এমনটাই হয়, "হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখি বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। দূরে দক্ষিণ দিকে নীচু পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ওরই গায়ে বোধহয় বৌদ্ধ গুহাগুলো। কাছেই একটা পানের দোকান থেকে ট্রানজিস্টারে হিন্দী ফিল্মের গান বাজছে। রাস্তার উল্টোদিকে একটা বন্ধ দোকানের সামনে দুটো লোক একটা বেঞ্চিতে বসে গলা উঁচিয়ে তর্ক করছে। কী নিয়ে সেটা বোঝার উপায় নেই, কারণ ভাষাটা বোধহয় মারাঠী..... দূর থেকে একটা ট্রেনের হুইস্‌ল শোনা গেল, একটা পাগড়ি পরা লোক সাইকেল করে বেল বাজাতে বাজাতে আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল, কোত্থেকে জানি একটা লোক 'এ মধুকর-এ মধুকর' বলে চেঁচিয়ে উঠল – সবই কেমন যেন নতুন নতুন।"[৬] তীক্ষ্ণদৃষ্টি সত্যজিৎ জানতেন, ভিজুয়ালে যা নেই তাকে শোনানো যায় দূর থেকে ভেসে আসা শব্দে। একটা শহরের ইমেজ প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেন তিনি শুধু অফস্ক্রিন সাউন্ডের সাহায্যেই। সুনির্বাচিত শব্দের বর্ণনাও যে সামগ্রিক পর্যবেক্ষণের অন্তর্গত সেটা লেখক প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন, "অন্ধকারে চোখ সয়ে গেছে, এখন চারদিকে চাইলে বট, অশ্বত্থ আমগাছ, বাঁশঝাড় – এসব বেশ তফাৎ করা যায়। ঝিঁঝিঁর গন্ধ ছাড়াও যে অন্য শব্দ আছে সেটা বেশ বুঝতে পারছি। ট্রেনের আওয়াজ, সাইকেল, রিক্সার চড়া হর্ন, রাস্তায় কুকুরের ঘেউ ঘেউ, এমন কি দূরের কোনো বাড়ি থেকে ট্রানজিস্টারের গান পর্যন্ত। ফেলুদার ঘড়িতে রেডিয়াম ডায়াল, তাই অন্ধকারেও টাইম দেখতে পারে।"[৭] দৃশ্যটি 'নেপোলিয়নের চিঠি' থেকে নেওয়া। শহরের কোনো ভিজুয়াল বর্ণনা এখানে সত্যজিৎ দেননি। কিন্তু ঘটনাটা যে ঘটেছে একটা মফঃস্বল শহরে, সেটা বলে দিতে হয় না। 'মহানগর' সিনেমাতেও সুব্রতদের পাড়ার অন্য কোনো বাড়ি দেখানো হয়নি। কিন্তু ওদের পাশের বাড়িটা যে বেশ গা ঘেষাঘেষি সেটা ধরা যায় অফস্ক্রিন শব্দের স্পষ্টতায়, রেডিও থেকে ভেসে আসা খবরে। কী সচেতন যত্নে যে সাজিয়েছেন সত্যজিৎ তাঁর এই সাউন্ডট্র্যাক। 'গোলাপী মুক্তা রহস্য' উপন্যাসে মগনলালের ডেরায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ফেলুদা এন্ড কোং। কাশীর এক নির্জন পাড়ায় তখন মধ্যরাত। চারদিকে কেউ কোথাও জেগে নেই। কিন্তু একটি মাত্র নিঝুম পাড়া নিশ্চয়ই শহর কাশীর প্রতিনিধি নয়। তাই কাশীর বিস্তারকে অফস্ক্রিন শব্দের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন সত্যজিৎ। মাঝরাতে কাশীতে যে নাচের জলসা বসে হারমোনিয়াম আর ঘুঙুর সেদিকেই ইঙ্গিত করে, "খুব মন দিয়ে শুনলে দূর থেকে হারমোনিয়াম আর ঘুঙুরের শব্দ পাওয়া যায়। আকাশের দিকে চাইলাম। এত তারা কলকাতার আকাশে কোনদিন দেখিনি।"[৮] 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল' -এ এভাবেই 'আর্কিটেকচারাল স্পেস,'কে কৌশলে ব্যবহার করেছেন লেখক। হেলমুট শেলভাঙ্কার, নিশিকান্ত বাবু, ফেলুদা আর তোপসে তখন রুমটেকে। সেখানকার তিব্বতি এক মঠের ছাদে রয়েছে তোপসে। ছাদের বর্ণনাই দিয়েছেন লেখক। তবে একতলায় বা উঠানে কী ঘটছে তা বোঝাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে অফস্ক্রিন সাউন্ড। একতলার সঙ্গে ছাদের দূরত্ব তাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি, "দোতলায় উঠে দেখি সামনে একটা ঘর রয়েছে, তার দরজা বন্ধ। এটাতেই কি সেই হাই পোজিশনের লামা থাকেন নাকি? বাঁ দিকে খোলা ছাদ, এখানে ওখানে নিশান ঝুলছে। একতলা থেকে নাচের বাজনার শব্দ আসছে– ভোঁ ভোঁ ভোঁ ঝ্যাং ঝ্যাং ঝ্যাং। এদের নাচ নাকি একবার শুরু হলে সাত আট ঘন্টার আগে থামে না।"[৯]

'পর্যায় ক্রমিক' শব্দের ব্যবহারে দক্ষ ছিলেন সত্যজিৎ। ঘটনার মোড় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে যখন শব্দের ব্যবহার পাল্টে যায় তখনই তা হয়ে ওঠে 'পর্যায় ক্রমিক' শব্দ। 'পথের পাঁচালী, "অপুর সংসার", "অপরাজিত" বা

"চারুলতা"য় যার মুনশিয়ানা দেখা যায়। ফেলুদা সিরিজেও এর প্রয়োগ লক্ষণীয়। এখানে 'জয় বাবা ফেলুনাথ' -এর কথা বলতেই হয়। রাস্তা যতবার মোড় পাল্টেছে ততবারই বদলে গেছে শব্দও, "এতক্ষণে এ-মোড় ও-মোড় ঘুরে আমরা যে গলিটায় পৌঁছেছিলাম সেটা একটু বিশেষ রকমের নির্জন। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত আশেপাশের বাড়িগুলোর ভিতর থেকে মানুষের গলার সুর পেয়েছি, বাচ্চার কান্নার শব্দ পেয়েছি। এবারের গলিটায় দূর থেকে ভেসে আসা মন্দিরের ঘন্টা ছাড়া আর কোনো শব্দই নেই।

একটু এগোতে শোনা গেল তার সঙ্গে আরেকটা শব্দও একটচানা একতালে হয়ে চলেছে ----- ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ....."[১০] সিনেমা বা সাহিত্য, থিম যাই হোক না কেন মানুষের একাকীত্বকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে সত্যজিৎ ব্যবহার করেছেন পাখির ডাক। 'ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা' বা 'টিনটোরেটার যীশু' এর সার্থক উদাহরণ। 'টিনটোরেটোর যীশু' গল্পে হংকং শহরে ফেলুদারা হারিয়ে গেছে। লোকসমাজ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন ফেলুদাদের একাকীত্বকে পাঠকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে গিয়ে সত্যজিৎ লিখছেন, "বাঁ দিকের দেয়ালে প্রায় দেড় মানুষ উঁচুতে একটা ছোট্ট জানালা, তাই দিয়ে ধোঁয়া মেশানো একটা ফিকে আলো আসছে। বোঝা যাচ্ছে দিনের আলো এখনও ফুরোয়নি। ডাইনে আর সামনে দুটো দরজা, দুটোই বন্ধ। শব্দের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছি।"[১১] 'কো-ইনসিডেন্টাল' শব্দের ব্যবহারেও তুখোড় ছিলেন লেখক। কো-ইনসিডেন্টাল শব্দের অর্থ একটি শব্দের সঙ্গে ঘটনাচক্রে আরেকটি শব্দের চলে আসা। গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে বাস্তব একটি শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করেছেন লেখক বারবার। হৃৎস্পন্দনের সমতুল্য শব্দ, যেমন ড্রাম, ঢাক, ঢোলক বা ঘড়ির শব্দকেও যথার্থ ব্যবহার করেছেন শ্রী রায়। তালবাদ্যের এক একটি বিট হৃৎস্পন্দনের কথাই মনে করায় আমাদের 'গোলাপী মুক্তা রহস্য', 'সোনার কেল্লা', 'বাদশাহী আংটি', 'লণ্ডনে ফেলুদা', 'শেয়াল দেবতা রহস্য' ইত্যাদি রচনার মধ্যে। যে সমাগত তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি এইসব ধ্বনির ব্যবহার করে,"..... হুকিনস্ চুপ। ঘরে একটা টেবিলক্লকের টিক টিক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।"[১২]

শিল্পীর ব্যক্তিগত মনন, চিন্তন এবং অনুভবের নিজস্ব রীতি প্রকাশ পায় শৈলীতে। আর যেকোনো শৈলীর প্রাণকেন্দ্র তার প্রাঞ্জলতায় সহজ সরলভাবে বক্তব্য উপস্থাপনে রচনা হয় আকর্ষণীয়। সত্যজিতের ক্ষেত্রে যে কথাটি না বললেই নয়, সেটি এই যে, পড়বার সময় কিশোর পাঠকরা তো বটেই, বয়স্ক ব্যক্তিরাও তরতর করে গল্পের সঙ্গে এগিয়ে যায়। অকারণ অলংকার বর্জিত অথচ আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে গল্পের মোদ্দা কথাটি এত সহজে বলে গেছেন যে শুরু করলে শেষ না করা পর্যন্ত রেহাই নেই। কথ্যবুলির বিরামহীন স্বচ্ছন্দতাই তাঁর জনপ্রিয়তাকে আকাশছোঁয়া করেছে। তাঁর গদ্যের নির্ভেজাল সারল্য এবং নির্মেদ দ্রুতি বিষয়বস্তুকে করেছে বিশ্বাসযোগ্য। বাংলা গদ্যের সঠিক রূপায়ণে তিনি অনন্য। সত্যজিতের গল্পের ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য আমরা এভাবে সাজাতে পারি–

ক) অনুপুঙ্খের দৃষ্টি ছিল তাঁর সামগ্রিকতার প্রতি।

খ) সত্যজিতের সাহিত্যরীতি চিত্রধর্মী। ডিটেল সম্পর্কে তিনিই শেষ কথা।

গ) যেখানে যতটুকু দরকার, ঠিক ততটুকুই দেখিয়েছেন তিনি। তাঁর ঋজু মেদহীন গদ্যে অলংকারের ব্যবহার কোথাও নেই।

ঘ) আবেগকে কীভাবে সংযত করতে হয়, সত্যজিতের গদ্য আমাদের তাই শেখায়।

ঙ) বুদ্ধিদীপ্ত ভাষায় কোথাও বাড়াবাড়ি নেই। শব্দ-অর্থের স্বাভাবিক বিন্যাসে তা ওতপ্রোত।
চ) যে প্রক্রিয়ায় সত্যজিৎ ছবি এঁকেছেন, সেই প্রক্রিয়ায় প্রত্যেকটি জিনিস চরিত্র হয়ে উঠেছে।

ড. বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গেই বলেছেন, "সবচেয়ে বড় কথা, বাংলা ভাষাকে অনেক চলিত সংস্কার থেকে মুক্তি দিয়ে সত্যজিৎ বিদগ্ধজনের লেখ্য ভাষার সঙ্গে চারু কথ্যভাষার এমন ভারসাম্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন যার জন্য একালেই বলা যায় যে আগামী কয়েক প্রজন্মের রসিকদের অভিনন্দন তিনি লাভ করবেন তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি রূপেই।"[১৩]

সত্যজিতের গদ্যের স্টাইল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নতুনত্বের স্বাদে অনন্য। তার গদ্য স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ও মেদহীন। ঋজু অথচ লাবণ্যময়। ঝরঝরে অকৃত্রিম এই গদ্যে যুক্ত হয়েছে প্রসাদগুণ। বিষয়বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিষয়োপযোগী। শব্দব্যবহারের ক্ষেত্রে সংযম ও বাক্যগঠনের পরিমিতিবোধ তাঁর লেখনীর বৈশিষ্ট্য। কাহিনি বিন্যাস, চরিত্রের উপস্থান বা ভাষা ব্যবহার– পরিশীলিত, পরিচ্ছন্ন মনের ছাপ রেখেছেন তিনি সর্বত্র। ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চারে তাঁর প্রাঞ্জল বর্ণনা সরস। শুধু পোশাকি বিন্যাসের ওপর নির্ভরশীল নয় এ গদ্যের আভরণ। 'দার্জিলিং জমজমাট'-এতো রহস্য ঘটনার সঙ্গে ভাষার অসাধারণ নিপুণতায় মিলেমিশে একাকার হয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘার বর্ণনা। সূর্যের গোলাপি রঙ, লাল টালির ছাদওয়ালা কাঠের বাংলোবাড়ি, ঘন ঝাউবন, খাড়াই পাহাড় আর সুন্দর বাগান, "এটাকে ঝাউবন বলা ঠিক নয়, কারণ এখানে পাইন, ফার, রডোডেনড্রন ইত্যাদি অনেক রকম চেনা-অচেনা গাছই আছে। গাছের মাঝে মাঝে ঝোপ রয়েছে, তাতে আবার লাল, নীল, হলদে ফুল। আজ দিনটা মেঘলা, তাই সমস্ত বনটাই আবছা অন্ধকারে ঢাকা।"[১৪] কিংবা ডাললেকের বর্ণনা দিচ্ছেন সত্যজিৎ, 'স্বচ্ছ কাচের মতো জল, হাওয়া নেই বলে ঢেউ নেই, তাই আয়নার মতো চারদিকের পাহাড়গুলো পাশ কাটিয়ে চলছে।"[১৫] উপমা রাঙানো ভাষাচিত্রও তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। অননুকরণীয় দুই-একটি লাইনে লিখছেন সত্যজিৎ, "মেঘের গাছে নিচের দিকে একটা খড়খড়ির মধ্যে একটিবার উঁকি দিয়ে সূর্যদেব যখন আজকের মতো ছুটি নিলেন..."[১৬] কিংবা "তবে গণ্ডগোল হল রাস্তা নিয়ে রোডস্ – বুঝছেন। আসলে এ দিকের পাহাড়গুলো যাকে বলে গ্রোইং মাউনটেনস্। এখনও বাড়ছে। তাই একটু অস্থির, বুঝেছেন– আর কাঁচা। ইয়াং বয়সে যা হয় আর কী– হে হে।"[১৭] কথকতার এই দুর্দান্ত স্টাইলটি একান্তভাবেই সত্যজিতীয়।

নিজের সমস্ত কাজেই ত্রুটিহীন নিশ্চিদ্র মনোযোগ নিয়ে এগিয়েছেন সত্যজিৎ। অনুপুঙ্খের দিকে তাঁর নজর ছিল ছেলেবেলা থেকেই। আর তাই সর্বত্রই জ্ঞান, বুদ্ধি, পরিশ্রম ও কল্পনার সুসমঞ্জস্য মিশ্রণের ছাপ সুস্পষ্ট। ক্ষেত্রটা যাই হোক, ক্যামেরার পিছনে অথবা লেখালেখির জগতে। কোথায় কতটুকু দেখাতে হয়, কোথায় রাশ টানতে হয় জানতেন সত্যজিৎ। তাঁর সিনেমায় একটা বাড়তি শট নেই। গদ্যেও একটি অতিরিক্ত শব্দ খরচ করেননি। প্রায় প্রতিটি গল্পেই শুধুমাত্র ভাষার সাহায্যে তৈরি করেছেন এক একটি সেট। ছোট ছোট বাক্যের ব্যবহার গল্পে রূপ নিয়েছে অসাধারণ। সংযোজক অব্যয় ধারেকাছে নেই কোথাও। সত্যজিৎ জানতেন সুনির্বাচিত শব্দের বর্ণনাও ডিটেলের কাজ করে, (ক) "বেশ বড় ঘর। দুটো পাশাপাশি খাট, তাতে আবার মশারির ব্যবস্থা রয়েছে। একপাশে একটা দু'জন বসার আর দুটো একজন বসার সোফা, আর একটা

গোল টেবিলের ওপরে একটা অ্যাশ-ট্রে। এছাড়া ড্রেসিং টেবিল, আলমারি আর খাটের পাশে দুটো ছোট টেবিলে জলের ফ্লাক্স, গেলাস আর বেডসাইড ল্যাম্প। ঘরের সঙ্গে লাগা বাথরুমের দরজাটা বা দিকে।"[১৮]
(খ) ঘরটা হল যাকে বলে স্টাডি রুম। চারিদিকে নানারকম শিল্পদ্রব্য আর বইয়ে ঠাসা। আলমারি। ঘরের মাঝখানে একটা বড় টেবিল। তার পিছনে একটা রিভলভিং চেয়ার।"[১৯]

ন্যারেটর তোপসের ভাষা যেমন স্মার্ট তেমনি ডায়নামিক। আর এর সবটুকুই সত্যজিতের একান্ত নিজস্ব। এই গদ্যশৈলী নিষ্পত্র অথচ ফলবতী লতার মতো মনোজ্ঞ। অন্তরঙ্গ সরল কৌতুকে ভরপুর। গাদাগুচ্ছের মর্চে ধরা বিশেষণ আর তথাকথিত লোক-খাড়া করা শব্দ ব্যবহারে কোনদিনই বিশ্বাসী ছিলেন না সত্যজিৎ। তোপসের ভাষা তাই বিশেষণকে বিশেষ প্রশ্রয় দেয় না। দেখাকে শুনিয়ে দেওয়া খুব শক্ত কাজ। এ ভাষার সে ক্ষমতা আছে। কিন্তু তাঁর মানে এই নয় যে এ ভাষায় কবিতা নেই, "ছোটবড় মেজ সেজো নানান সাইজের সাদা-কালো খয়েরি পাটকিলে ছিটদার সব পাথর ডিঙিয়ে পাশ কাটিয়ে, যুগযুগ ধরে সেগুলোকে মোলায়েম করে পালিশ করে ব্যস্তবাগীশ ভেড়া তড়িঘড়ি ছুটে চলেছে দামোদরে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে। এই ঝাঁপের জায়গাই হল রাজারাপ্পা।"[২০] আসলে একজন আর্টিস্ট যিনি বস্তুকে রঙ সমেত চাক্ষুস করে দিতে চান, এ গদ্য তাঁর গদ্য। সংযম ও যথাযথতার এ এক নিখুঁত শিল্পকর্ম।

বাস্তবতাবোধ এবং মাত্রাবোধ সম্পর্কে সবসময়ই সচেতন ছিলেন সত্যজিৎ। এমনকি সংলাপ রচনার ক্ষেত্রেও একচুলও টাল খাননি তিনি। তদ্ভব ও তৎসম শব্দের সমন্বয়ে গদ্যে এসেছে অপূর্ব সুষমা। বাংলার কথ্য মেজাজের বিরোধিতা না করে বাক্যগুলিকে করেছেন শিল্পসম্মত। ক্রিয়াপদ বর্জিত বাক্যের নান্দনিক ব্যবহারে তিনি সিদ্ধহস্ত, (ক) "কাঁচাপাকা মেশানো ঝোলা গোঁফ, চোখে মোটা কাঁচের চশমা, গায়ে কালো গলাবন্ধ কোট, হাঁটুর উপর তোলা ধুতি, আর মোজার উপর বাটার তৈরি ব্রাউন কেড্‌স জুতো।"[২১]
(খ) "এখানে ডানার একটা অংশ, ওখানে ল্যাজের টুকরো, ওইদিকে আবার থুবড়োনো নাকের খানিকটা।"[২২]

(গ) "অচেনা ভদ্রলোকটির গায়ের রং হলদে, সর্বাঙ্গে মেচেতা, মাথায় টাক, দুটো দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো, বয়স ষাট-পয়ষট্টি।"[২৩]

সাধারণ বাঙালির মুখের স্বাভাবিক যে ভাষা সেই ভাষাতেই কথা বলেছে ফেলুদা সিরিজের চরিত্ররা। অফিসে, আদালতে, বাজারহাটে, ট্রামে-বাসে আমরা মধ্যবিত্ত মানুষ যে ভাষায় কথা বলি, এ সেই ভাষা। এমনকি ইংরেজি শব্দের প্রয়োগও হুবহু বাস্তব থেকে তুলে আনা–

(ক) "জটায়ু। ফাইটার। কী ফাইটটা দিয়েছিল রাবণকে বলুন তো।"[২৪]
(খ) "মৃত্যু মানে তো এনিবডিজ ডেথ হতে পারে– তাই না?"[২৫]
(গ) "থ্যাঙ্কস্ ফর দা খোঁচা।"[২৬]
(ঘ) "সাধুবাবা বাথরুমে গিয়ে ভ্যানিস করে গেল?"[২৭]
(ঙ) "মাঝারি হাইট, ফরসা রঙ, বয়স পঞ্চাশ-টঞ্চাশ।"[২৮]

সত্যজিৎ সবসময়ই গদ্যের বাক্যে শব্দ নিয়ে খেলা করেছেন। সহজ, সুন্দর, স্বচ্ছ, রসসমৃদ্ধ এই ভাষা ফেলুদার গল্পগুলির অবিশ্বাসী জনপ্রিয়তার অন্যতম হাতিয়ার। এমন ভাষা যেকোনো লেখকের কাছেই ঈর্ষণীয়। গোয়েন্দা গল্পে আটপৌরে শব্দের ব্যবহারে বাজিমাৎ করেছেন সত্যজিৎ। 'মিত্র' তাই হয়েছে 'মিত্তির'। বৃহস্পতিবার হয়েছে 'বিষ্যুদবার'। মিস্ত্রির বদলে এসেছে মিস্তিরি'। এতদিন-এর জায়গায় "অ্যাদ্দিন', সপ্তাহ-এর বদলে 'হপ্তা'। অফিসের জায়গায় তিনি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেছেন 'আপিস'। বাংলা গদ্যে যে আটপৌরে শব্দের ব্যবহার এত সহজ ও সাবলীল হতে পারে, তাকে যে ইচ্ছেমতো বাঁকানো, হেলানো, দোমড়ানো, মোচড়ানো সম্ভব– সত্যজিতের আগে ভাবতেই পারিনি আমরা। গল্পে চিত্রকল্প, দৃশ্যরস আর ডিটেলের ব্যবহার তিনি করেছেন সিনেমার মতোই। তাঁর গল্প তাই আর শুধু গল্প থাকেনি। জীবন্ত শরীররূপে আবির্ভূত হয়েছে। তাঁর গল্প আমরা শুধু পড়ি না, দেখিও। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, "আমরা যখন গল্পগুলো (সত্যজিৎ রায়ের) পড়ি তখন যে সিনেম্যাটিক অনুপুঙ্খগুলোকে সবসময় খেয়াল করি, তা নয়।"

গল্প পড়তে পড়তে আমাদের মন ও চোখ, এমনকি আমাদের ঘ্রাণও কাজ করে।"[২৯] সত্যজিতের গদ্যকে সবচেয়ে বেশি জীবন্ত করেছে লালমোহনবাবুর ইংরেজি– ভুলভাল ইংরেজি। লেখকের পরিমার্জিত রসিকতা গল্পগুলিকে দারুণ সরস করে তুলেছে। 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ' গল্পে লালমোহনবাবুর বিখ্যাত বাবুমার্কা ইংরেজি উচ্চারণ আজও হাস্যরসাত্মক, "শের তো ভাগা, বাট হাউ?"[৩০] অথবা, "চিকেন হেড ইয়েসটারডে, মাটনই হোক টুমরো।"[৩১] কিংবা, "গতবার ডেজার্ট আর এবার স্নো? ফ্রম দি ফ্রাইং প্যান টু দি ফ্রিজিডিয়ার।"[৩২] উত্তেজনাপ্রবণ ভদ্রলোকটি উত্তেজনার মাথায় যেভাবে কথা গুলিয়ে ফেলেন সেটাও কম উপভোগ্য নয়। 'বাক্স রহস্য' গল্পের সেই বিখ্যাত ভুল উক্তি, "এ যে সেই বিখ্যাত ম্যানুষপ্রিন্ট"[৩৩] আবার 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ' -এ দেখি "দি সার্কাস থুইচ এসকেপড ফ্রম দি গ্রেট ম্যাজেস্টিক টাইগার।"[৩৪] ভয়ের মুহূর্তে যেকোনো ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে মহাপ্রাণের নিঃশ্বাস মিশে যাওয়া– চ বলতে ছ, কে বলতে খে বলে ফেলা আমাদের মনে পড়ে। আর সবকিছুকে ছাপিয়ে রয়েছে তাঁর আতঙ্কিত উচ্চারণ 'হ্যায়েস' (হ্যাঁ+ইয়েস)। বাংলা ইংরেজি মেশানো জটায়ুর সংলাপ তো যুগ যুগ ধরে মনে রাখার মতো। ধাঁধার মতো প্রাণবন্ত, রসে টইটম্বুর, "ফর মাই কালেকশন– অ্যান্ড এস এ স্মৃতিচিহ্ন অফ আওয়ার পাওয়ারফুল অ্যাডভেঞ্চার ইন রাজস্থান।"[৩৫] শুধু এই উক্তিটির জন্যও তো বাংলা গদ্যে চিরন্তন হয়ে থাকবেন সত্যজিৎ।

উপসংহার : বক্তব্য আর ভাষা এই দুইয়ে মিলেই গল্প। আর গল্পের আর্ট তার বলার ভঙ্গিতে। ছেলেবেলা থেকেই জমিয়ে গল্প বলার ক্ষমতা ছিল সত্যজিতের। খুব ভালো করেই তিনি জানতেন গল্পের শুরুতে একগাদা বর্ণনা হড়হড় করে ঢেলে দিলে পাঠক হাবুডুবু খায়, ওটা দিতে হয় গল্পের ফাঁকে ফাঁকে। খাঁটি রসের ভাণ্ড নিয়ে জন্মেছিলেন তিনি। সাসপেন্স, অ্যাকশন আর হিউমারের এত সুন্দর উপস্থাপনা বাংলা গোয়েন্দা কাহিনিতে এখনও পর্যন্ত সন্দেহাতীতভাবে আর কেউই করতে পারেননি। বাচ্চাদের মন ভোলানোর তাগিদ থেকে তাঁর গল্পরচনা নয়। চমক সৃষ্টি বা নৈতিক উপদেশ বিলোবার জন্যও তিনি কলম ধরেননি। তাঁর গোয়েন্দা গল্পগুলি কিশোর পাঠককে যেমন বড়ো হতে সাহায্য করে তেমনি বয়স্কদের ফিরিয়ে আনে

কৈশোরে। কিশোর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই রহস্যগল্পগুলিতে ভায়োলেন্সকে একচিলতে স্থান দেননি তিনি। বিস্ময়করভাবে সত্যজিতের প্রতিটি গল্পই 'horror element' বর্জিত। কাহিনি বিন্যাস, চরিত্র চিত্রণ– সবেতেই রয়েছে একটা বেনজির টেকনিক্যাল ফিনিশ। বাঙালির 'দাদা' ট্রাডিশনে তাঁর ফেলুদা আদ্যন্ত মৌলিক সৃষ্টি। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নাগরিকসুলভ ভাষার শাশ্বত সম্পদ নিয়ে বাংলা সাহিত্যের পূর্ববর্তী সমস্ত গোয়েন্দা কাহিনিকে ছাড়িয়ে গেছেন সত্যজিৎ। যথার্থ বলেছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, "বাংলা ভাষায় শক্তিধর কথাসাহিত্যিকের অভাব আগেও ছিল না, আজও নেই। কিন্তু বালক থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের পাঠককে আর কেউ কখনও গল্পের মোহিনী মায়ায় এইভাবে বন্দি করে রাখতে পেরেছেন বলে আমার মনে হয় না। এমন তো নয় যে, তিনি আলাদা-আলাদা গল্প লিখেছেন, আলাদা-আলাদা বয়সের পাঠক-পাঠিকার জন্য। গল্প তো একই। কিন্তু এমনই তার জাদু যে, তারই জালে ধরা পড়ে যাচ্ছেন সব বয়সের মানুষ।"[৩৬]

তথ্যসূত্র ঃ

১. সত্যজিৎ স্মরণ সংখ্যা, আগস্ট ১৯৯২, পৃঃ ১৩৫

২. বিশ্বাস, সুখেন; বাংলা সাহিত্যে সত্যজিৎ রায়; প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০১; ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা– ১৩, পৃঃ ৮১

৩. রায়, সত্যজিৎ প্রবন্ধ সংগ্রহ; প্রথম সংস্করণ মে ২০১৫; আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা– ৯, পৃঃ ২৩

৪. রায়, সত্যজিৎ; ফেলুদা সমগ্র (২য় খণ্ড), ভূমিকা, লীলা মজুমদার; ১ম সংস্করণ ২০০৫, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা–৯

৫. রুদ্র, সুব্রত (সম্পাদিত); সত্যজিৎ জীবন আর শিল্প; প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬; প্রতিভাস, কলকাতা– ২, পৃঃ ৯৮৫

৬. রায়, সত্যজিৎ; কৈলাসে কেলেঙ্কারি (ফেলুদা সমগ্র, ১ম খণ্ড); ১ম সংস্করণ ২০০৫; আনন্দ, কলকাতা– ৯, পৃঃ ৩৩৭

৭. প্রাগুক্ত, নেপোলিয়নের চিঠি, পৃঃ ১৬০

৮. প্রাগুক্ত, গোলাপী মুক্তা রহস্য, পৃঃ ৫৬১

৯. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, গ্যাংটকে গণ্ডগোল, পৃঃ ১৫১

১০. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, জয় বাবা ফেলুনাথ, পৃঃ ৪৭৮

১১. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, টিনটোরেটোর যীশু, পৃঃ ২০৯-২০১০

১২. প্রাগুক্ত, লন্ডনে ফেলুদা, পৃঃ ৫৯৮

১৩. ঘোষ, বিজিত (সম্পাদিত), সত্যজিৎ প্রতিভা; র‍্যাডিকেল ইম্প্রেশন, কলকাতা, পৃঃ ১১৭

১৪. প্রাগুক্ত, দার্জিলিং জমজমাট, পৃঃ ৩৭৯

১৫. প্রাগুক্ত, ভুস্বর্গ ভয়ঙ্কর, পৃঃ ৩৯৩

১৬. প্রাগুক্ত, ছিন্নমস্তার অভিশাপ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৬৭৪

১৭. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, গ্যাংটকে গণ্ডগোল, পৃঃ ১২১

১৮. প্রাগুক্ত, সোনার কেল্লা, পৃঃ ১৯৮

১৯. প্রাগুক্ত, শকুন্তলার কণ্ঠহার, পৃঃ ৪৯৫

২০. প্রাগুক্ত, ছিন্নমস্তার অভিশাপ, পৃঃ ৬৬১

২১. প্রাগুক্ত, শেয়াল দেবতা রহস্য, পৃঃ ১১০
২২. কৈলাসে কেলেঙ্কারি, পৃঃ ৩২৩-৩২৪
২৩. প্রাগুক্ত, গোঁসাইপুর সরগরম, পৃঃ ৬১৭
২৪. প্রাগুক্ত, সোনার কেল্লা, পৃঃ ১৯৪
২৫. প্রাগুক্ত, গ্যাংটকে গণ্ডগোল, পৃঃ ১৪৫
২৬. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর, পৃঃ ৪২৪
২৭. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, বাদশাহী আংটি, পৃঃ ৪৫
২৮. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা, পৃঃ ২৪১
২৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন; বিষয় সত্যজিৎ; নাভানা; কলকাতা, পৃঃ ৫৬
৩০. রায়, সত্যজিৎ; ছিন্নমস্তার অভিশাপ (ফেলুদা সমগ্র, ১ম খণ্ড); ১ম সংস্করণ ২০০৫; আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা– ৯, পৃঃ ৬৫০
৩১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৫৩
৩২. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, বাক্স রহস্য, পৃঃ ২৬২
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯২
৩৪. প্রাগুক্ত, ছিন্নমস্তার অভিশাপ, পৃঃ ৬৭৭
৩৫. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, সোনার কেল্লা, পৃঃ ২৪৩
৩৬. রায়, সুব্রত (সম্পাদিত) : সত্যজিৎ জীবন আর শিল্প; প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৬; প্রতিভাস, কলকাতা– ২, পৃঃ ৯৮২